INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাঁচটি উপন্যাসের আলোকে নারীমনের মানবিক সংকট ও নৈতিক মূল্যবোধ: ফিরে দেখা

* সুব্রত দাস

https://doi.org/10.5281/zenodo.21075680

সারসংক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য সৃষ্টিকর্মের মধ্যে নারীর স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদা, অধিকার, সার্বজনীনতার মহত্তর দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ্য করি। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, চিঠিপত্র, গান, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর গুরুত্ব ও স্বকীয়তা বিষয়ে কবি অকপট। তাই রবীন্দ্রসাহিত্যে নিরুপমা, বিনোদিনী, আশালতা, হাসি, বিভা, সুরমা, বিমলা, এলা, দামিনী, চন্দরা, আনন্দময়ী, অন্নপূর্ণা, খেমংকরী, নন্দিনী, চিত্রাঙ্গদা, সুচরিতা, ললিতা, লাবণ্য প্রভৃতি সকলেই নিজস্ব স্বকীয়তায় বিদ্যমান। রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের মহত্তর ক্ষেত্রে নারীর বিচরণক্ষেত্র ও নারীকৃত প্রশ্নচিহ্নের মাঝে বারবার নারীর স্বাধিকারের কথা রবীন্দ্রনাথ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফুটিয়ে তুলেছেন তার কলমের আঁচরে। বর্তমান প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রথম পাঁচটি উপন্যাসে নারীদের মানবিক সংকট নৈতিক দর্শনের প্রেক্ষিতে আলোচিত হয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

মূলশব্দ : মানবিকতা, নৈতিকতা, স্বাধীনতা, হৃদয়বত্তা, সমতা, সংকট ।

** সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রামানন্দ সেন্টেনারি কলেজ*

ভূমিকা:

রবীন্দ্র উপন্যাসসমূহের গভীর অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় সেখানে মানবিকতা, সহানুভূতি, সত্যের প্রতি আনুগত্য ও আত্ম-অন্বেষণ প্রভৃতি বিষয় গভীর মমতায় লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে নৈতিকতা হলো অন্তরের সত্য ও মানবকল্যাণের আদর্শের পালন। মানুষ তার কাছে শুধু জৈবিকসত্ত্বা নয়, বরং মানুষ তার জীবসীমাকে অতিক্রম করে যেন বৃহতের সঙ্গে তার একত্বকে অনুভব করতে পারে, বিশ্বে মানবকল্যাণে ব্রতী হতে পারে এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ এক নতুন পৃথিবী গঠন করতে পারে। এই সকল সম্ভাবনা উপনিষদের ঋষির মত রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকেও প্রেরণা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে নারী চরিত্রসমূহের মাধ্যমে তাদের স্বাতন্ত্র্য, অধিকারবোধ, স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নারীকে ঘরের আবদ্ধ ঘেরাটোপে বন্দী করে রেখে তাদের মানবিক অবমাননা রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়েছে বার বার। তাই তার মানবিক মন সকল কর্মে নারীর স্বাধিকারের ঘোষণা করতে চেয়েছে। শুধুমাত্র সংসারজীবনে নয়, সামাজিক প্রয়োজনে নারী সক্রিয়ভাবে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজ অগ্রগতিতে সহায় হতে পারে-একথার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যকর্মের সৃষ্ট নারী চরিত্রসমূহের মধ্য দিয়ে ঘটিয়েছেন।

কালপরম্পরায় রবীন্দ্রনাথ রচিত উপন্যাসগুলো হল করুণা (১৮৭৭-৭৮), বউ ঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩), রাজর্ষি (১৮৮৭), চোখের বালি (১৯০৩), নৌকাডুবি (১৯০৬) প্রজাপতির নির্বন্ধ (১৯০৮) গোরা (১৯১০),ঘরে বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুই বোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪) ও চার অধ্যায়(১৯৩৪)। এখন রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রথম পাঁচটি উপন্যাসের অনুসরণে নারীমনের মানবিক সংকটসমূহ আলোচনা করা যাক।

করুণা (১৮৭৭-৭৮)

'করুণা' রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সে লেখা প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটি ঠাকুরবাড়ির মাসিক পত্রিকা 'ভারতী'তে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস থেকে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। নিতান্ত অল্প বয়সে লিখিত উপন্যাসটিকে রবীন্দ্রনাথ 'জ্যাঠামি' বলে সম্বোধিত করেছেন। তবে কাহিনীটিকে তিনি নির্দিষ্ট পরিনামে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছেন। দুটি ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা নরনারী (নরেন্দ্র-করুণা, মহেন্দ্র-রজনী)'র জীবন আলেখ্য এই উপন্যাসের মূল আলোচনার বিষয়। করুণা ও রজনীর বিবাহপরবর্তী জীবনে মানবিক টানাপোড়েন রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। অবশ্য বিধবা রমণী মোহিনীর জীবনের চর্চাও মানবিক বোধ থেকে অল্প পরিসরে রবীন্দ্রনাথ করেছেন। বড়লোক আদুরে ঘরে উপন্যাসের নায়িকা মাতৃহীনা করুণা পিতা অনুপকুমারের স্নেহের ছায়ায় পালিত হওয়ায় ছিল বাস্তববোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অবশ্য পিতার উদাসীনতা ও মাত্রাতিরিক্ত কন্যাস্নেহের ফলে করুনার মধ্যে বয়সের সাথে সাথে নারীসত্তার পূর্ণ মানসিক বিস্তার ঘটতে পারেনি। তাই পিতা অনুপকুমারের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই সার্বভৌম পন্ডিতের সহায়তায় অনুপকুমারের আশ্রিত নরেন্দ্রর সাথে করুণার বিবাহ সম্পন্ন হয়। তবে গ্রাম থেকে শহরে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে নরেন্দ্রের কলকাতাবাস তার চালচলনে একটা পরিবর্তন এনে দেয় যা করুণার সাথে তার বিবাহের পরই ক্রমাগত প্রকাশ পেতে থাকে। যদিও বাস্তবের মারপ্যাঁচ করুনাকে প্রথম প্রথম খুব একটা সমস্যায় ফেলেনি। তার ভাবুক মন পিতার বাগানে গাছপালার সাথে

সখ্যতা করে, তাদের সাথে তার মনের সকল কথা ব্যক্ত করে সময় কাটাতো। এমনকি নরেন্দ্রের আচরণে অভিমানিনী করুণা তার কল্পিত জগতেই সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করেছে। তবে নরেন্দ্রের মাঝে মাঝে দীর্ঘ অনুপস্থিতি তাকে বিচলিত করেছে। সরলহৃদয় করুণা বাড়ির পুরাতন পরিচারিকা ভবির কাছে নরেন্দ্রর না ফেরার কারণ জানতে চেয়েছে। উত্তর না পেয়ে সে ব্যথিত হয়েছে। ক্রমে স্বামীকর্তৃক অবহেলা এবং অনাদর তার মনে অভিমানের জন্ম দিয়েছে। তাই সে অনর্থক অনিয়মে নিজেকে পীড়া দিয়েছে:

"অনেক পীড়াপীড়িতে ভবির কাছে বিশেষ কোন উত্তর পাইল না। করুণা অতিশয় বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল ও প্রতিজ্ঞা করিল যে যদি মঙ্গলবারের মধ্যে নরেন্দ্র না আসেন তবে তাহার যতগুলি পুতুল আছে সব জলে ফেলিয়া দিবে। ভবি বুঝাইয়া দিল যে, পুতুল ভাঙিয়া ফেলিলেই যে নরেন্দ্রের আসিবার বিশেষ কোনো সুবিধা হইবে তাহা নহে" (Tagore, 2004, p. 16)

করুনার নরেন্দ্রকে ঘিরে আগ্রহ নরেন্দ্রর কাছে কখনোই মূল্য পায়নি। নরেন্দ্রের বিবাহ পরবর্তী চরিত্রের ক্রমপ্রকাশ্যতা করুণাকে যারপরনাই ব্যথিত করেছে:

"দিনে দিনে করুনার মুখ মলিন হইয়া আসিতেছে। নরেন্দ্র যখন কলিকাতায় থাকিত ছিল ভালো। চব্বিশ ঘন্টা চোখের সম্মুখে থাকিলে কাহাকেই বা চিনা যায়? নরেন্দ্রর স্বভাব করুণান নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। করুনার কিছুই তাহার ভালো লাগিত না। সর্বদাই খিটখিট, সর্বদাই বিরক্ত। এক মুহূর্তও মুখে ভালো কথা কহিতে জানে না। অধিকন্তু করুণা যখন হরষে উৎফুল্ল হইয়া তাহার নিকট আসে, তখন সে সহসা এমন বিরক্ত হইয়া উঠে যে করুণার মন একেবারে দমিয়া যায়। নরেন্দ্র সর্বদাই এমন রুষ্ট থাকে যে করুণা তাহাকে সকল কথা বলিতে সাহস করে না। সকল সময় তাহার কাছে যাইতে ভয় করে পাছে সে বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিয়া উঠে। তদভিন্ন সন্ধ্যাবেলা তাহার নিকট কাহারো ঘেঁসিবার জো ছিল না। সে মাতাল হইয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিত। যা হউক, করুণার মুখ দিনে দিনে মলিন হইয়া আসিতে লাগিল। অলীক কল্পনা বা সামান্য অভিমান ব্যতীত অন্য কোন কারণে করুনার চক্ষে প্রায় জল দেখি নাই-এইবার হতভাগিনী আন্তরিক মনের কষ্টে কাঁদিল।" (Tagore, 2004, p. 17)

কিন্তু তার মন:পীড়া কখনো নরেন্দ্রের সহানুভূতি আদায় করতে পারেনি। পরিবর্তে করুণার পীড়াই বৃদ্ধি করেছে:

"করুনার শরীর অসুস্থ হইয়াছে। অনর্থক কতকগুলো অনিয়ম করিয়া তাহার পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। নরেন্দ্র কহিল সে দিবারাত্র এক পীড়া লইয়া থাকিতে পারে না; তাই বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।" (Tagore, 2004, p. 18)

তাই পুরাতন দাসী ভবিই তার সান্তনার স্থল হয়ে উঠেছে। অবশেষে করুণা সন্তানসম্ভবা হয়েছে। ও শিশুপুত্রের জন্ম দিয়েছে। তাতেও সে নরেন্দ্রের মন ভোলাতে পারেনি। আত্মস্বার্থান্ধ নরেন্দ্র পুত্রটির ভবিষ্যতের কোন চিন্তাই করেনি, পরিবর্তে শুধু স্ত্রী-পুত্রকে যারপরনাই পীড়ন করেছে। যার ফল শিশুপুত্রটির অকাল মৃত্যু।এই পুত্রের মৃত্যুপরবর্তী করুনার মানসিক পীড়া, জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিনাম ক্রমে করুনাকে পীড়ন করতে থাকে।তাই সে নীরবে নিজ মৃত্যু কামনা করতে থাকে। অবশ্য অভাগী করুণার জীবনের সংকট এবং তার ট্রাজেডিক পরিণতির অবসান ঘটলো না। তাই নিধির প্ররোচনায় সরলা, নিষ্পাপ করুণার মাথায় স্বরূপকে জড়িয়ে কলঙ্কের টিকা এঁকে দিয়ে তাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছে পিশাচ নরেন্দ্র। অবশ্য নানা ঘটনা পরম্পরার পর সে এক সময়ে পথভ্রষ্ট নরেন্দ্রের

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

একদা সহচর মহেন্দ্র, যে জীবনের কষাঘাতে নিজেকে শুদ্ধ করে স্ত্রী রজনীর কাছে ফিরে আসছিল, তার আশ্রয় লাভ করে। মহেন্দ্রের স্ত্রী রজনীর কাছে করুণা পায় নির্ভরতার স্থল। তবে নরেন্দ্রের পত্রপ্রাপ্তির পর তার মানবিক মন মহেন্দ্রকে অনুরোধ করে নরেন্দ্রকে বিপদ হতে উদ্ধারের জন্য। মহেন্দ্রের পরামর্শে নরেন্দ্র নিজেকে বদলাবার প্রতিশ্রুতি দিলেও সে প্রতিশ্রুতি সে কখনো পালন করেনি। সে এর পরও করুণার উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। তাই একরাশ অভিমান বুকে নিয়ে, কারো প্রতি কোনো অনুযোগ না রেখে সে নিঃশব্দে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

মাতৃহীন পিতার সংসারে সংসার জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞা করুণার মানসিক সংকট কখনও জীবনবীণায় সুরের ঝংকার তুলতে পারেনি। জীবন সম্পর্কে সচেতন হলে হয়তো তার সংসারজীবন অনেক অঘটন রোধ করতে পারত। অতিমাত্রায় উদাসীনতা, অসংযমী ও বিশৃঙ্খল প্রবৃত্তির শিকার মহেন্দ্রকে তার যোগ্য স্থান নির্ধারিত করে দিতে হবে সেই স্বাধীনচেতা মানসিকতার জন্ম দেয়নি করুণার মধ্যে, যা আমরা রবীন্দ্রনাথের পরিণতবয়সে রচনার অনেক নারীচরিত্রে লক্ষ্য করি। ফলে এক অবহেলিত নারীর মতোই সে মানসিক সংকটের মধ্য দিয়েই তার জীবন অতিবাহিত করেছে।

উপন্যাসে উপকাহিনী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্র-রজনীর গল্পের অবতারণা করলেও রজনীর মানসিক দিকটিকেও তিনি কোন অংশে কম গুরুত্ব দেননি। ধনীগৃহে জন্ম লাভ করলেও কাঙ্খিত রূপের অধিকারিনী রজনী ছিল না। ফলে নিজের রূপ নিয়ে সে বরাবর একটা হীনমন্যতায় ভুগেছে। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রজনীর পরিচয়দান এরূপে করেছেন:

"কন্যাকর্তাদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া মহেন্দ্রের পিতা যে কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন তাহা মহেন্দ্রের বড় মনোনীত হয় নাই। মনোনীত না হইবারই কথা বটে। তাহার নাম রজনী ছিল; বর্ণও রজনীর ন্যায় অন্ধকার। তাহার গঠনও যে কিছু উৎকৃষ্ট ছিল তাহা নয়, কিন্তু মুখ দেখিলে তাহাকে অতিশয় ভালো মানুষ বলিয়া বোধ হয়। বেচারি কখনো কাহারো কাছে আদর পায় নাই। পিত্রালয়ে অতিশয় উপেক্ষিত হইয়াছিল। বিশেষত তাহার রূপের দোষে বর পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া যাহার তাহার কাছে তাহাকে নিগ্রহ হইতে হইত। কখনো কারো সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করে নাই। একদিন আয়না খুলিয়া কপালে টিপ পরিতেছিল বলিয়া কত লোকে কত রকম ঠাট্টা বিদ্রুপ করিয়াছিল; সেই অবধি উপহাসের ভয়ে বেচারী কখনো আয়নাও খুলে নাই, কখনো বেশভূষাও করে নাই।" (Tagore, 2004, p. 5)

তাই বিবাহপরবর্তী স্বামীর উদাসীনতা ও অবজ্ঞা তার নিত্যসঙ্গী হল। নারীত্বের এই অপমান কোনো নারীর পক্ষেই মেনে নেওয়া সহজ নয়। অধিকন্ত স্ত্রীর রূপহীনতার কারণে স্বামী যদি অন্য কোন রূপসী নারীর প্রতি আসক্ত হয় সেই অপমান নারীচিত্তে যে প্রবল আঘাত করে তার বেদনা সেই নারী অনুভব করতে পারে যে ভুক্তভোগী। সেই কারণে রজনীর মানসিক যন্ত্রণা আর স্বামীকে আগলাতে না পারার দৈন্য তার চিত্তকে যারপরনাই পীড়িত করতে থাকে। সে জড়বৎ সংসারের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে:

"রজনী মহেন্দ্রকে যত্ন করিত, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে করিতে সাহস করিত না। সে গোপনে মহেন্দ্রের খাবার গুছাইয়া দিত, বিছানা বিছাইয়া দিত এবং অল্পস্বল্প যাহা কিছু মাসোহারা পাইত তাহা মহেন্দ্রের খাদ্য ও আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিতেই ব্যয় করিত, কিন্তু এ সকল কথা কেহ জানিতে পাইত না। গ্রামের বালিকারা, প্রতিবেশিনীরা এত লোক থাকিতে নির্দোষী রজনীরই প্রতি কার্যে দোষারোপ

করিত, এমনকি বাড়ির দাসিরাও মাঝে মাঝে তাহাকে দুই এক কথা শুনাইতে ত্রুটি করিত না। কিন্তু রজনী তাহাতে একটি কথাও কহিত না।" (Tagore, 2004, p. 13)

অতঃপর বিধবা মোহিনীর গৃহে নৈশ অভিযানের অপবাদ রটনার লজ্জায় মহেন্দ্র গৃহত্যাগ করলে সে দায়ও যখন শ্বশুরগৃহে রজনীরই উপর বর্তায় এবং চারিদিকের অপমান, অসম্মান তার ওপর বর্ষিত হতে থাকে, তখন তার নারী মন মহেন্দ্রের জীবন হতে সরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় ও এই মর্মে মোহিনীর সাহায্যে মহেন্দ্রকে একখানি পত্র প্রেরণ করে। সমস্ত দায়ভার নিজের মাথায় পেতে নিয়ে রজনী তার দিদির বাড়ি চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। দেহে রূপের অভাব এবং তার জন্য স্বামীসুখের বঞ্চনা-এ অসহনীয়তা যে কিভাবে নারীর জীবন নরকসদৃশ্ করে তুলতে পারে তা রজনীর মানসিক সমস্যার মধ্য দিয়ে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। এ যন্ত্রনা এক কথায় অসহনীয়। মহেন্দ্রের উপেক্ষা ক্রমাগত রজনীকে কৃচ্ছসাধনার দিকে ঠেলে দিয়েছে। অবশ্য ঘটনা পরম্পরায় মহেন্দ্রের চৈতন্য উদয় হলে রজনীকে সে পূর্ণ মর্যাদা দান করে গ্রহণ করে এবং তাকে জীবন্মৃত অবস্থা হতে মুক্তিদান করে। রজনীর এই সমস্যা যেন তৎকালীন কুরুপা সকল নারীদেরই মানবিক সমস্যা। তাই লেখক রজনীর মাধ্যমে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তার অঙ্কন করলেন। এখানে যেন নিষ্কলুষ ভালোবাসারই জয় ঘোষণা হলো।

করুণা উপন্যাসে বিধবা মোহিনীর যে মানসিক সংকটকে লেখক তুলে ধরলেন তার মাধ্যমে তৎকালীন অল্পবয়সী বিধবা রমণীদের বৈধব্যের দুর্বিষহ জীবনকে ফুটিয়ে তুললেন। অকালবিধবা রমণীগণের মানসিক দিক কিভাবে সমাজের রক্ষণশীল মানসিকতার দ্বারা পদপৃষ্ঠ হয়েছে, তার সত্যতা যেন এই রমণীর মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। তাদের নিজের জীবনে কোন আশা থাকতে নেই, সংসার রচনার আকাঙ্ক্ষা থাকতে নেই। বিধবা মানেই যেন সৈয়দ মুজতবা আলীর গল্পের সেই পঁয়তাল্লিশ নম্বর কয়েদির মত বন্দী জীবন। বিধবাদের সমাজে আর কোন পরিচয় নেই, তার বৈধব্য ছাড়া। তাই মোহিনী অল্পবয়স্ক এবং রূপবতী হলেও তার কপালে বৈধব্যের পর আর সংসার জোটেনি। তবে তার মানবিক মন রজনীর সান্তনার স্থল হয়ে উঠেছিল:

"মোহিনী প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তাহার কাছে আসিত। প্রত্যহ তাহাকে যথাসাধ্য যত্ন করিত ও প্রত্যহ দেখিত সে দিনে দিনে অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়িতেছে।" (Tagore, 2004, p. 33)

আবার, মহেন্দ্রের চিত্ত পরিবর্তনের সংবাদ রজনীর কাছে পাওয়ার পর রজনীর হিতাকাঙ্খী হিসেবে সে আপ্লুত হয়েছে। তাই স্বল্প পরিসরে হলেও মোহিনী যেন উপন্যাসে সমীহ আদায় করেছে পাঠকের।

বউ ঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩)

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস 'বউ ঠাকুরানীর হাট' ভারতী পত্রিকায় ১২৮৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাস হতে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থ আকারে এটি ১১ জানুয়ারি, ১৮৮৩ সালে প্রকাশ হয়। উপন্যাসটি মূলত যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের অহমিকার পরিনামের সাক্ষ্য বহন করলেও এবং প্রধান চরিত্র হিসেবে প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য, বসন্ত রায়, রামচন্দ্র রায় প্রমুখ পুরুষ চরিত্র উল্লেখিত হলেও প্রতাপাদিতকন্যা বিভা, পুত্রবধূ সুরমা ও রাজমহিষীর মানবিক দ্বন্দ্ব উপন্যাসকে গতিময় করেছে।

প্রথমেই উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যের পুত্রবধূ, উদয়াদিত্যের পত্নী সুরমার কথায় আসি। চরিত্রটি অল্প পরিসরে উপন্যাসে তার সৌরভ ছড়িয়ে গেছে।

সে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ এমনকি নিজের জীবনকেও উৎসর্গ করতে পিছপা হয়নি। যশোহরের রাজগৃহে পুত্রের অতিমানবিকতার জন্য প্রতাপাদিত্য পুত্রবধূ সুরমাকেই দায়ী করেছে। তাই তাকে উদয়াদিত্যের জীবন থেকে দূরে সরাতে চেয়েছে। তার স্বামী উদয়াদিত্য তার সবচেয়ে বড় স্পর্শকাতর জায়গা। তাই উদয়ের মানবিক আবেগ, পরহিতৈষণা সুরমাকে আরো বেশি করে আকর্ষণ করেছে উদয়ের দিকে। যার ফলস্বরূপ তার ভাগ্যে জুটেছে অকথ্য অপমান। প্রথম পরিচ্ছেদে উদয়াদিত্যের কথার মধ্য দিয়ে এই সত্যের পরিচয় আমরা পাই:

"এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে সুরমা? এদিকে রাজসভায় সভাসদগণ কেমন একপ্রকার কৃপা দৃষ্টিতে আমার প্রতি চায়। ওদিকে অন্তপুরে মা তোমাকে লাঞ্ছনা করিতেছেন। দাসদাসীরা পর্যন্ত তোমাকে তেমন মানে না। আমি কাহাকেও ভালো করিয়া কিছু বলিতে পারি না, চুপ করিয়া থাকি, সহ্য করিয়া যাই। তোমার তেজস্বী স্বভাব, কিন্তু তুমিও নীরবে সহিয়া যাও।" (Tagore, Rabindra Rachanabali, Prothom Khanda(Sulovo Sanskaran), Bengali Version, 1427 (Bengali year), p. 610)

তাই প্রতাপাদিত্য যখন তাকে পিতৃগৃহে পাঠানোর ব্যবস্থা করে, সে তখন স্বামী উদয়াদিত্যের জন্য মনোবেদনা অনুভব করে। যুবরাজের সুখে দুঃখে থাকতে পারবে না এই আশঙ্কায় সে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এই নির্বাসন তাই তার কাছে মৃত্যুর সমান প্রতিপন্ন হয়েছে। সুরমার এই মনোবেদনার একটা ছবি ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই:

"সুরমার মনেও অনেকক্ষণ ধরিয়া সেইরূপ একটা আশঙ্কা জন্মিতেছে। সে যেন দেখিতে পাইতেছে, একটা কঠোর হস্ত তাহার উদয়াদিত্যকে তাহার কাছ হইতে সরাইয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। সে মনে মনে উদয়াদিত্যকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। মনে মনে কহিল, "আমি ছাড়িব না, আমাকে কেহ ছাড়াইতে পারিবে না।" (Tagore, Rabindra Rachanabali, Prothom Khanda(Sulovo Sanskaran), Bengali Version, 1427 (Bengali year), p. 645)

অবশেষে বিষপানের দ্বারা তার মৃত্যু সংঘটিত করে এক নিষ্ঠুর নিয়তি সুরমার জন্য লিখিত হয়েছে। এহেন হৃদয়হীনতা যেন সুরমাকে প্রতি পদে পদে মানসিক যাতনার দ্বারা আত্মহননের দিকে চালিত করেছে। সে স্বেচ্ছামৃত্যুবরণ করে প্রতাপাদিত্যের দম্ভকে উপহাস করে গেছে।

উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যকন্যা বিভার মানবিক সমস্যা সুরমার মতোই পাঠককে আবিষ্ট করে। উপন্যাসের বউ ঠাকুরানী 'বিভা' সব থেকেও যেন সব হতে বঞ্চিত। পিতা প্রতাপাদিত্যের মাত্রাতিরিক্ত দম্ভ এবং অপরিনামদর্শিতা, পুত্র উদয়াদিত্যের সাথে সাথে কন্যা বিভার জীবনেও চরম বিপর্যয়ের সূচনা করে। পিতৃব্য বসন্ত রায় এবং দাদা উদয়ের মানবিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিভা এক উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও মনুষ্যত্ববোধের অধিকারিনী ছিল। কিন্তু বসন্ত রায়ের হত্যার সিদ্ধান্ত বিভার মনকে যেন ব্যথাতুর করে তোলে। জামাতা রামচন্দ্র রায়ের উদ্ধারকার্যে সক্রিয় সহযোগিতার জন্যই যে বসন্ত রায়কে এই মূল্য চোকাতে হলো সে বেদনা বিভাকে গ্রাস করে ফেলে। এদিকে বৌদি সুরমাকে অন্যায় ভাবে ষড়যন্ত্র করে হত্যা ও দাদা উদয়ের প্রতি পিতা প্রতাপাদিত্যের কঠোর আদেশ ও কারাগারে নিক্ষেপ তাকে স্থির থাকতে দেয় না।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও পিতার অপরিনামদর্শিতার কারণে বিভাকে স্বামীসুখ হতে বঞ্চিত হতে হয়। স্বামীকে হত্যার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সে পিতা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে পারে না, শুধুমাত্র নিষ্ফল অশ্রুবিসর্জন

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

ছাড়া। তাই আসন্ন বৈধব্যের হাত থেকে বাঁচতে সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে রামচন্দ্র রায়ের বিপদমুক্তির। আবার রামমোহন মালকে রামচন্দ্র রায় বিভাকে পিতৃগৃহ হতে ফিরিয়ে আনবার জন্য দূতরূপে প্রেরণ করলে এবং প্রতাপাদিত্য সে আবেদন অগ্রাহ্য করলে লাজুক বিভা এখানেও পিতার আচরণের কোন প্রতিবাদ করেনা, শুধুমাত্র মর্মে মর্মে দগ্ধ হয়। অবশেষে রাজমহিষীর সিদ্ধান্তে যখন বিভা পতিগৃহে ফিরে যেতে মনস্থ করল এবং চন্দ্রদ্বীপে পদার্পণ করল তখন রামমোহনের মুখে সে শুনল "মা জননী, আজ তোমার রাজ্যে তোমার স্থান নাই, তোমার রাজবাটিতে তোমার গৃহ নাই। আজ মহারাজ বিবাহ করিতেছেন।" (Tagore, Rabindra Rachanabali, Prothom Khanda(Sulovo Sanskaran), Bengali Version, 1427 (Bengali year), p. 696)

তখন বিভার সামনে সকল কিছুই যেন অন্ধকার:

"স্বামীর রাজ্যের মধ্যে আসিয়া রাজধানীর কাছে পৌঁছিয়া, রাজপুরির দুয়ারে আসিয়া তৃষ্ণার্ত-হৃদয় বিভার সমস্ত সুখের আশা মরীচিকার মতো মিলাইয়া গেল।।" (Tagore, Rabindra Rachanabali, Prothom Khanda (Sulovo Sanskaran), Bengali Version, 1427 (Bengali year), p. 696)

অবশেষে সেবক রামমোহন মাল ও দাদা উদয়াদিত্যের সাথে সে সকল মনোবেদনার উপশমের জন্য কাশীবাসেরই সিদ্ধান্ত নেয়। নরম মনের অধিকারিনী হওয়ায় একের পর এক নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হয়েছে বিভা। তার আর্ত নিঃশব্দ হাহাকার দ্রবীভূত করেছে পাঠকের হৃদয়কে।

উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যের পত্নী চরিত্রটির বিচরণক্ষেত্র যদিও প্রতাপাদিত্যের রাজমহলেই সীমাবদ্ধ, তবুও তার মানসিক সংকটসমূহও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। পুত্র উদয়াদিত্য ও কন্যা বিভার মানবিক মনস্কতা ও তার জন্য পিতা প্রতাপাদিত্যের বিড়াগভাজন হওয়াকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সমস্যায় সেও মা হিসেবে সন্তানের যন্ত্রণায় মনোকষ্টে ভোগে। তার জননীসত্তা উদয়াদিত্যের অনিষ্ট কল্পনা করে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কন্যা বিভার অনিশ্চিত সংসার জীবনের কল্পনা করে সর্বদা এক যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়। এক স্নেহশীলা জননীর এই আর্ত হাহাকার রবীন্দ্রনাথ অল্প পরিসরে হলেও খুব নিখুঁতভাবে অঙ্কন করেছেন।

রাজর্ষি (১৮৮৭)

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় উপন্যাস 'রাজর্ষি' বালক পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ২৬ টি পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয় এবং পরের বছর ১২৯৩ বঙ্গাব্দে (১৮৮৭) বাকি ১৮ টি পরিচ্ছেদসহ প্রকাশ হয়। এই উপন্যাসের গল্পের মূল বিষয় ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমানিক্যের কাহিনী। তবে উপন্যাসে নারী চরিত্রের উপস্থিতি অন্যান্য উপন্যাস বিচারে অতি অল্পই বলা যায় এবং একপ্রকার পুরুষ চরিত্রসমূহের মধ্য দিয়েই লেখকের যাবতীয় অভিলাষ ব্যক্ত হয়েছে বলা যায়। তবুও উপন্যাসের ঘটনাপরম্পরার প্লট পরিবর্তনে এক ক্ষুদ্র বালিকা 'হাসি'র অবতারণা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাকে মানুষের বিবেকের কণ্ঠস্বরের ন্যায় উপন্যাসের প্রথম অংশে উপস্থাপন করলেন। এই হাসির ভুবনেশ্বরী মন্দিরে বলির রক্তের দাগ নদীর ঘাটের সিঁড়িতে দেখে বিস্মিত প্রশ্ন "এত রক্ত কেন?"(পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭০৪) শিশুর মনের ভেতরে এক বেদনার বহিঃপ্রকাশ কে রাজা গোবিন্দমানিক্যের সম্মুখে প্রকাশ করে। এই একটিমাত্র প্রশ্নের কাছে যেন শুধু মানুষ নয়, মনুষ্যেতর প্রাণীর জীবনের মূল্যও সূচিত হয়। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম জীব হিসেবে মানুষের মধ্যে দয়া, মায়া,

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

ভালোবাসার পরিবর্তে পৈশাচিক রক্তন্মাদনা যেন মানুষকে পশুত্বের চেয়েও নিকৃষ্টতর স্থানে নামিয়ে আনে-এ সত্যের প্রকাশ করার মানসে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা রাজপরিবারের মহত্তম এই কাহিনীর প্লট রচনা করতে গিয়ে এ বালিকার প্রসঙ্গকে নিয়ে এলেন। শিশুরা স্বভাবত নিষ্পাপ। তাই কোন রাজদণ্ডের ভয় ব্যতিরেকেই তারা নিজের মনের ভাবকে ব্যক্ত করতে পারে। তাই হঠাৎ রক্তের ধারা দেখে মানসিক বিকারের ঘোরে বালিকা হাসির মৃত্যু ঘটলো। কিন্তু এই মৃত্যুই যেন বদলে দিল রাজা গোবিন্দমানিক্যের আজন্মলালিত সংস্কারকে। তাই মন্দিরে বলি বন্ধের প্রসঙ্গে তিনি রাজপুরোহিত রঘুপতিকে জগদীশ্বরী মায়ের আদেশের কথা শোনালেন:

"না ঠাকুর, এতদিন আমরা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে। একটি বালিকার মূর্তি ধরিয়া মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন না।" (Tagore, Rabindra Rachanabali, Prothom Khanda(Sulovo Sanskaran), Bengali Version, 1427 (Bengali year), p. 706)

ফলে বালিকার এই মানসিক সংকট হতে জাত প্রশ্ন যেন সার্বজনীন রূপ নিয়েছে। তার ব্যঞ্জনার্থ যেন সমগ্র সমাজকে এক প্রশ্নের সম্মুখে এনে দাঁড় করালো-প্রকৃত উপাসনা কখনো বাহ্যিক আরম্বরের সাধন নয়, বরং হৃদয়ের কলুষিত প্রবৃত্তির সংশোধন-এই ধ্রুব সত্যের মুখোমুখি করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ বলেই আমাদের মনে হয়।

চোখের বালি (১৯০৩)

রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ উপন্যাস 'চোখের বালি' একটি সামাজিক উপন্যাস। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে এটি বৈশাখ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ থেকে কার্তিক ১৩০৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৯০৩ সালে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ পায়। তৎকালীন আধুনিক জীবনযাত্রায় মানুষের সম্পর্কের টানাপোড়েন, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বোপরি সংঘাতকে রবীন্দ্রনাথ সুনিপুণভাবে উপন্যাসে আলোচনা করেছেন। এখানে কাহিনী শুধুমাত্র অলীক আদর্শকল্পনায় মগ্ন না হয়ে তা বাস্তব সমাজের যেন জীবন্ত দর্পণ হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক কলকাতার এক সমাজচিত্রকে লেখক অন্নপূর্ণা, বিহারী, মহেন্দ্র, আশালতা, রাজলক্ষ্মী, বিনোদিনী প্রমূখ চরিত্র চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে বাস্তব রূপ দিয়েছেন। চরিত্রসমূহের মনের সকল কথাই ব্যক্ত হয়েছে কোন আবরণ না রেখে। অবশ্য উপন্যাসের নারী চরিত্রসমূহের যে মানসিক অন্তর্বেদনার কথা রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে পরম মমতায় পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন যাতে চরিত্রসমূহ শুধু উপন্যাসের সীমায় আবদ্ধ থাকেনি বরং তাদের মানবিক সমস্যাসংকুল জীবন পাঠকের কাছে বাস্তব হয়ে উঠেছে। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী যথার্থই বলেছেন:

"চোখের বালিতে আকর্ষণীয় ঘটনা বা নাটকীয় পরিস্থিতির অভাব না থাকলেও এটিতে নরনারীর মনোজীবনের প্রতিফলনই বেশিমাত্রায় ঘটেছে একথা কারো অজানা নেই। আর এর ফলেই উপন্যাসটিতে কালের বিন্যাস কোথাও কোথাও নতুন রূপ নিয়েছে।" (Roychaudhury, 2017, p. 34)

আবার, জ্যোতির্ময় ঘোষ মহাশয় 'চোখের বালি'র গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছেন:

"বস্তুত যে সমকালীন সামাজিক মানুষ ও জীবন নভেল অর্থে উপন্যাসের প্রকৃত উপজীব্য, সেই মানুষ ও জীবনকে সঠিক অর্থে এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ ধরতে পারলেন তার সাহিত্যে। এই আকুতি তার প্রথমাবধি। তার অসংখ্য নজির আছে। কিন্তু সত্যি সত্যিই সেই মানুষের জীবনকে এইভাবে ছুঁতে পারা,

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

এর আগে তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।" (Ghosh, 2017, p. 30)

এখন উপন্যাসে আশালতা, বিনোদিনী, অন্নপূর্ণা, রাজলক্ষ্মী প্রমুখ প্রধান নারী চরিত্রসমূহের মানসিক সংকটসমূহ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

উপন্যাসে জীবনের টানাপোড়েন ও চরিত্রসমূহের মানসিক দ্বন্দ্ব যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে যে জীবন এক সরলরৈখিক পথে গতিশীল ছিল, তাই যেন বাস্তবের ছলচাতুরিতে এক দুর্বিষহ জীবনে পরিণত হয়েছে। অবশ্যই যার কথা এই উপমার মধ্য দিয়ে বলা হলো সে আর কেউ নয়, মহেন্দ্রের স্ত্রী সরলহৃদয়া আশালতা। বিবাহলগ্নে সে ছিল নিতান্তই সরলা ও সংসারের মারপ্যাঁচে অনভিজ্ঞ:

"আশা লজ্জিতসুন্দরদেহে লজ্জিতমুগ্ধমুখে আপন নূতন সংসারে প্রথম পদার্পণ করিল; তাহার এই কুলায়ের মধ্যে কোথাও যে কোন কন্টক আছে তাহা তাহার কম্পিত-কোমল হৃদয় অনুভব করিল না; বরঞ্চ জগতে তাহার একমাত্র মাতৃস্থানিয়া অন্নপূর্ণার কাছে আসিতেছে বলিয়া আশ্বাসে ও আনন্দে তাহার সর্বপ্রকার ভয় সংশয় দূর হইয়া গেল।" (Tagore, Rabindra Rachanabali, Dwitiya Khanda(Sulovo Sanskaran), Bengali version, 1426(Bengali year), p. 381)

আসলে সংসারজীবনে তার অনভিজ্ঞতা ও মহেন্দ্রের অতি মাত্রায় স্ত্রী আসক্তি যে বিনোদিনী নামক এক ঘূর্ণিঝড়কে তার জীবনে নিয়ে এসে সব ওলট পালট করে দিয়ে যাবে, তার পূর্ব সংকেত বোধহয় সে আশঙ্কা করেনি। তাই রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে সাথে নিয়ে এলে সে সরল অন্তঃকরণে তার সাথে সখ্যতা স্থাপন করে। স্বামী মহেন্দ্র যে বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এ ভাবনা তার মনে আসেনি। তাই সে মনে মনে ব্যথিত হয়েছে মহেন্দ্রের মানসিক অত্যাচারে।

জ্যাঠামশাই এর সংসারে মানুষ হওয়ায় জটিল সংসারের রহস্য ভেদ করবার কৌশল আশালতা জানত না। তাই প্রতি পদে পদে সে তার নিজ অপূর্ণতার জন্য অন্তরে দগ্ধ হয়েছে। মাসিমা অন্নপূর্ণার সান্নিধ্য পেলেও সে শাশুড়ি রাজলক্ষ্মীর নিষ্পেষণে সদা সংকুচিত হয়ে থেকেছে। তার মানবিক আবেদন স্বামীর কাছেও কোন সমাদর লাভ করেনি, বরং বিনোদিনীর সাথে তুলনা তাকে হীনমন্যতায় নিমজ্জিত করেছে:

"মহেন্দ্র যখন আত্মবিস্মৃত হইয়া বিনোদিনীর সহিত তুলনা দিয়া আশাকে ধিক্কার দিয়াছে, তখন সে তাহা বিনয়ে ও বিনা বিদ্বেষে গ্রহণ করিয়াছে।" (Tagore, Rabindra Rachanabali, Dwitiya Khanda(Sulovo Sanskaran), Bengali version, 1426(Bengali year), p. 411)

আবার বৃদ্ধা রাজলক্ষ্মীর কাছেও সে বিনোদিনীর পটুত্বের জন্য কোন স্থান না পেয়ে ব্যথিত হয়েছে:

"আশা এক একবার তাহার রুগ্না শাশুড়ির ঘরের আশপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। এক একবার লজ্জিতভাবে ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। সে নিজেকে সংসারের পক্ষে আবশ্যক করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করে, সে কাজ দেখাইতে চায়, কিন্তু কেহ তাহার কাজ চায় না। সে জানেনা কেমন করিয়া কাজের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, কেমন করিয়া সংসারের মধ্যে স্থান করিয়া লইতে হয়। সে নিজের অক্ষমতার সংকোচে বাহিরে ফিরে। তাহার কি একটা মনোবেদনার কথা অন্তরে প্রতিদিন বাড়িতেছে; কিন্তু তাহার সেই অপরিস্ফুট বেদনা, সেই অব্যক্ত আশঙ্কাকে সে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে না। সে অনুভব করে তাহার চারিদিকে সমস্তই

সে যেন নষ্ট করিতেছে-কিন্তু কেমন করিয়া যে তাহা গড়িয়া উঠিয়া ছিল এবং কেমন করিয়া যে তাহা নষ্ট হইতেছে এবং কেমন করিলে যে তাহার প্রতিকার হইতে পারে তাহা সে জানে না। থাকিয়া থাকিয়া কেবল গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, 'আমি অত্যন্ত অযোগ্য, নিতান্ত অক্ষম, আমার মূঢ়তার কোথাও তুলনা নাই।" (Tagore, Rabindra Rachanabali, Dwitiya Khanda(Sulovo Sanskaran), Bengali version, 1426(Bengali year), pp. 411-412)

এই মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতেও সে সংসারের যাবতীয় কর্ম তার সাধ্যমত করে গেছে। এমনকি বিনোদিনীকে নিয়ে মহেন্দ্র গৃহত্যাগ করলেও সে আত্মহননের পথ বেছে নেয় নি বরং বিহারীর সহায়তায় মহেন্দ্রের সংসারের হাল ধরেছে, নিজেকে বাস্তবের মাটিতে যোগ্য করেছে। সে ধীরে ধীরে রাজলক্ষ্মীর ভালবাসাও অর্জন করেছে তার কর্মনিষ্ঠা দিয়ে। এহেন কর্তব্যপরায়ণ আশালতা সকল মানসিক যাতনার উর্ধ্বে উঠে মানবিকভাবে এবং নিষ্কামভাবে তার কর্তব্যে অবিচল থেকেছে। স্বামীসুখবঞ্চিতা এক শুদ্ধা রমনীর এ মানসিক হাহাকার তাই সহজেই পাঠকের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।অবশেষে অনুতপ্ত মহেন্দ্র সংসারে ফিরে এলে সে রাজলক্ষ্মীর মুখ চেয়ে তাকে ক্ষমা করেছে। তবে পুনরায় বিনোদিনীকে দেখে সে অস্তিত্বের সংকটকে অনুভব করেছে নিজের মধ্যে:

"আজ বিনোদিনীকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার খন্ডিত প্রেমের দাহ শান্তি মানিল না। ইহাকে মহেন্দ্র একদিন ভালবাসিয়াছিল, ইহাকে এখনো হয়তো মনে মনে ভালোবাসে-একথা তাহার বুকের ভিতরে ঢেউয়ের মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিবে, বিনোদিনীকে দেখিবে-কি জানি কি চক্ষে দেখিবে। কাল রাত্রিতে আশা তাহার সমস্ত সংসারকে নিষ্কণ্টক দেখিয়াছিল-আজ প্রত্যুষে উঠিয়াই দেখিল কাঁটাগাছ তাহার ঘরের প্রাঙ্গনেই। সংসারে সুখের স্থানই সবচেয়ে সংকীর্ণ-কোথাও তাহাকে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে রাখিবার অবকাশ নাই।" (Tagore, Rabindra Rachanabali, Dwitiya Khanda(Sulovo Sanskaran), Bengali version, 1426(Bengali year), p. 513)

তাই পিসিমা অন্নপূর্ণার পরামর্শই শেষে তার ভরসার স্থল হয়েছে:

"তুই বিনোদিনীর সঙ্গে এমন ব্যবহার কর, যেন সে কখনো তোর কোন অনিষ্ট করে নাই।" (Tagore, Rabindra Rachanabali, Dwitiya Khanda (Sulovo Sanskaran), Bengali version, 1426(Bengali year), p. 514)

আশার যে ক্ষতিসাধন স্বামী মহেন্দ্র, শাশুড়ি রাজলক্ষ্মী ও বিনোদিনীর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে তা অপূরণীয়, কিন্তু সেই সবকিছু ভুলে, সকল প্রাপ্তির ভান করে অবশিষ্ট জীবন পরিচালনা এক কঠিন ব্রত। তাই উপন্যাসে সবচেয়ে মানবিক সমস্যাজড়িত চরিত্র আশালতা একথা অবশ্যস্বীকার্য।

চোখের বালি উপন্যাসে বিনোদিনীর যে মানসিক বেদনা তার মধ্যে এক অতৃপ্ত নারীর প্রেমবুভুক্ষু হৃদয়বত্তার টানকে আমরা লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট এই নারীচরিত্রটি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন কর্মদক্ষ, রুচিশীলা, সুন্দরী যুবতী। কিন্তু তার উপযুক্ত সমাদর না পাওয়ায় তার মধ্যে জন্ম নেওয়া বিদ্রোহের আগুন সমগ্র উপন্যাসে সমস্ত চরিত্রের গতিপথকে নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী চালিত করেছে। মহেন্দ্রের তাকে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আশালতার মত অতি সাধারণ মেয়েকে বিয়ে এবং তার সাথে বারাসাত নিবাসী রাজলক্ষ্মীর রুগ্ন ভাইপো বিপিন এর বিয়ে তার মধ্যে যে অতৃপ্তির জন্ম দিয়েছিল, তার ফলে রাজলক্ষ্মীর অন্তরের সুপ্ত ইচ্ছাটি বুঝে নিয়ে আশালতা ও মহেন্দ্রের সংসারে

সর্বনাশের বীজ সে বপন করতে সক্ষম হয়েছিল। আসলে মহেন্দ্রের স্থানে এক রুগ্ন ব্যক্তির সাথে বিবাহ তার মন:পুত হয়নি। ফলে তার অকালবৈধব্য মানসিকভাবে হতাশ করেছিল বিনোদিনীকে। আসলে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রটির নির্মাণে তাকে সর্বগুনসম্পন্ন করে করে তুলেছেন। তাই উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই নারী পড়লে সংসার জীবনকে স্বর্গীয় মহিমা দান করতে পারত। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য তাকে টেনে নিয়ে চলল এক অনির্দিষ্ট পথে। তাই মহেন্দ্রের সংসারে আশা ও মহেন্দ্রের প্রণয়লীলা তাকে বিতৃষ্ণ করেছে। তার ব্যক্তিত্বপূর্ণ নারীসত্তা তীব্রভাবে আঘাত পেয়েছে। তাকে উপেক্ষা করে আশালতাকে গ্রহণ বিনোদিনীর অন্তরের ক্রোধের আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করেছে:

"তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যে দিকে চায়, তাহার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গবর্ষণ হইতে থাকে। 'এমন সুখের ঘরকন্না - এমন সোহাগের স্বামী, এ ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তখন কি এ ঘরের এই দশা, এ মানুষের এই ছিরি থাকিত। আমার জায়গায় কি না এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল!" (Tagore, Rabindra Rachanabali, Dwitiya Khanda (Sulovo Sanskaran), Bengali version, 1426(Bengali year), p. 396)

তাই তার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যেন এক ধ্বংসের উন্মত্ত খেলায় মেতেছে। অবশ্য আশার ঢাল হয়ে বিহারীর নিরন্তর শুভাকাঙ্ক্ষীতার জন্য সে সম্পূর্ণরূপে তার কুটিল অভিপ্সা চরিতার্থ করতে পারেনি। তাই বিহারী তাকে আশার খেয়াল রাখার কথা বললে তার মন এক কুটিল হাসিতে ভরে ওঠে:

"বিহারী অন্ধকারে মুখ দেখিতে পাইল না, সে মুখে হিংসার বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। আজ বিহারীকে দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল যে আশার জন্য তাহার হৃদয় ব্যথিত।" (Tagore, Rabindra Rachanabali, Dwitiya Khanda(Sulovo Sanskaran), Bengali version, 1426(Bengali year), p. 415)

অবশ্য তার মধ্যে থাকা সেবাব্রত, তার দৃঢ়চিত্ততা একসময় বিহারির চোখে তাকে দেবীর ন্যায় প্রতিভাত করে। তাই বিহারীকে বিনোদিনী তার ভালোবাসা নিবেদন করে। বিনোদিনীর বিধ্বংসী প্রবণতার অবসান তখনই ঘটতো যদি সে বিহারীর আশ্রয় ও স্বীকৃতি পেত। তবে তার রূপ, গুণ সমস্ত কিছু নিয়েই সে মহেন্দ্রের সংসার হতে সরে গিয়ে বিহারীর সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্নজাল বুনেছিল। কিন্তু যতবার সে বিহারির কাছে গেছে, তাকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে হয়েছে। ফলে অতৃপ্ত প্রেম যে ক্রোধের সংসার করেছে, তাতেই ভস্মীভূত হয়েছে আশা-মহেন্দ্রের সংসার। পুরুষের হৃদয়রাজ্যেই নারীর প্রেমের প্রকৃত স্থান। তাই বিহারীর বিনোদিনীর প্রতি ঔদাসীন্য ও আশালতার প্রতি কর্তব্যের চিন্তা বিনোদিনীকে সর্বনাশের পথে চালিত করেছে:

"বিনোদিনী। শুন ঠাকুরপো, আমি নির্লজ্জ হইয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে ফিরাইতে পারিতে। মহেন্দ্র আমাকে ভালোবাসে বটে, কিন্তু সে নিরেট অন্ধ, আমাকে কিছুই বোঝে না। একবার মনে হইয়াছিল, তুমি আমাকে যেন বুঝিয়াছ -একবার তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলে-সত্য করিয়া বল, সে কথা আজ চাপা দিতে চেষ্টা করিও না।" (Tagore, Rabindra Rachanabali, Dwitiya Khanda(Sulovo Sanskaran), Bengali version, 1426(Bengali year), p. 461)

এই বিহারীর মধ্যেই বিনোদিনী খুঁজে পেতে চেয়েছে এক নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। মহেন্দ্রের বিহারীকে তাচ্ছিল্যের প্রত্যুত্তরে তাই বিনোদিনী ঘৃণাবর্ষণ করেছে মহেন্দ্রর প্রতি।

বিহারী বিনোদিনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করতে পারেনি। হয়ত বিনোদিনী তার আশ্রয় পেলে মহেন্দ্রের সংসারে দুর্দিন ঘনিয়ে আসত না। অবশেষে বিহারী তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেও বিহারীর লোকনিন্দার ভয়ে বিনোদিনী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ও রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর পর সে অন্নপূর্ণার সাথে কাশীবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারো প্রতি কোন অভিযোগ না রেখে।

উপন্যাসে অন্নপূর্ণা বাল্যবিধবা। তিনি এগার বছর বয়সে স্বামীহারা হয়েছেন এবং নিঃসন্তান অবস্থায় স্বামীগৃহেই বড় জা রাজলক্ষ্মী ও তার পুত্র মহেন্দ্রর সাথে তার জীবন অতিবাহিত করেছেন। অবশ্য একথা বলা অবশ্যই উচিত হবে যে অভিভাবকহীন মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারী মহেন্দ্রর চেয়ে তার অধিক স্নেহ পেয়েছে। তাই সে ভাতুস্পুত্রী আশালতার সাথে বিহারীর বিবাহ দিয়ে অসহায় কন্যাটিকে সুখী করতে চেয়েছে। রাজলক্ষ্মীর এক গোপন ঈর্ষা তার অন্তরকে সর্বদা ব্যথিত করেছে। তবে মহেন্দ্র কে তিনি পুত্রসম ভালোবেসেছেন এবং মহেন্দ্র তার কাকিমাকে মায়ের মতই একইভাবে আঁকড়ে ধরেছে।

এই অন্নপূর্ণা মহেন্দ্র ও বিহারীর স্নেহের স্থল। আবার অনাথা আশালতার সান্তনার আশ্রয়ও হয়ে উঠেছেন। তবে বাল্যবিধবা এই নারী জীবনে অনেক মন:কষ্টের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। রাজলক্ষ্মীর তীক্ষ্ণ বাক্যবানে আহত হয়ে অনেক সময় চোখের জল ফেলেছেন নীরবে। জীবনসমুদ্রে গরল পান করে দেবাদিদেব মহাদেবের মতো সংসারে সকলকে অমৃতদানের চেষ্টা করে গিয়েছেন, আর নিজেকে সঁপে দিয়েছেন জগৎকর্তার পায়ে। একসময় রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষা ও ক্রোধের শিকার হয়ে সংসার ত্যাগ করে তিনি কাশী চলে গিয়েছেন। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের চরণে গিয়েও মহেন্দ্র, আশালতা ও বিহারীর চিন্তা সর্বক্ষণ তার পিছু ছাড়েনি। তাই যখন রাজলক্ষ্মী বিপর্যস্ত, মহেন্দ্র বিনোদিনীর সাথে পলায়ন করেছে, আশা যখন অকুল সংসারে সহায়হীনা, সেদিন অন্নপূর্ণা স্থির থাকতে পারেনি। সে ছুটে এসেছে তাদের সাংসারিক প্রয়োজনে। ফলে কাহিনীর জটিলতা ও সংকটমোচনে অন্নপূর্ণা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। তাই অনুতপ্ত হয়ে মহেন্দ্র ও বিনোদিনী ফিরে এলে সে বিনোদিনীকে সাথে নিয়ে কাশী গেছে এবং যাবার কালে আশালতার মানসিক দ্বিধা নিরসন করে গেছে একজন স্নেহশীলা মায়ের মত। জীবনবোধের গভীরতাই হয়ে উঠেছিল অন্নপূর্ণার দুঃখজয়ের প্রধান শক্তি। স্বামীকে হারিয়ে বিধবা হওয়ার পর তিনি সমস্ত চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনাকে স্বেচ্ছায় যেন নির্বাসিত করেছেন এবং যা শ্রেয় তার উপদেশ তিনি সকলকে দিয়ে গেছেন।

উপন্যাসে মহেন্দ্রজননী রাজলক্ষ্মীর যে সমস্যা, তা প্রকৃত অর্থে মানবিক। আপাতদৃষ্টিতে তাকে স্বার্থপর মনে হতে পারে। তবে একটু গভীরে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে স্বামীহীনা বিধবা বৃদ্ধার জীবনে পুত্র একটা পরম নির্ভরতা তথা স্নেহের স্থল। সেই পুত্রের থেকে অবহেলার ভয় সকল মায়েরই মনস্তত্ত্বে এক শূন্যতার বোধ সৃষ্টি করে। তাই প্রাপ্তবয়স্ক মহেন্দ্রের বিবাহের চিন্তা তাকে পুত্র হতে বিচ্ছেদের ভয়ে ভাবিত করে। এই অশুভ চিন্তা তাকে আশা ও মহেন্দ্রের নববিবাহিত জীবনে দাম্পত্যের মধ্যে পুত্রের তার প্রতি অবহেলার সূচনা একথা ভাবতে বাধ্য করে। তাই নববধূকে নিজের কাছে রেখে সে ঘরকন্নার সকল কাজ শেখানোতে প্রবৃত্ত হয়। এতে মহেন্দ্র অসন্তুষ্ট হলে এই ঘটনার জন্য সে অন্নপূর্ণার ষড়যন্ত্র আছে মনে করে তার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়। আসলে পুত্রবধূর কাছে সেবাকামনাকে কখনো অন্যায় বলে দাবি করা যায় না। তবে আর পাঁচটা বাঙালি পরিবারের মতোই সেও পুত্রের উদাসীনতায় একটা অস্তিত্বের সংকটে ভুগেছে। তাই অসমবয়সী

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

পুত্রবধূকে সে ঈর্ষা করেছে এবং তার প্রতি সুপ্ত আক্রোশ থেকে বারাসাত হতে দূরসম্পর্কীয় ভাতুষ্পুত্র বিপিনের বিধবা পত্নী বিনোদিনীকে সংসারে আমদানি করেছে। যার ফলস্বরূপ আশার সংসারজীবন দুর্বিষহ হয়েছে।

তবে এ ধরনের অপবাদ রাজলক্ষ্মীর মানবিকতাবোধের উপর আঘাত বলেই মনে হয়। কেননা সদ্যবিধবা বিনোদিনীকে আশ্রয়দান করার মধ্যে রাজলক্ষ্মীর মানবিক মনের পরিচয় আমরা পাই। হয়তো তার মনের কোন এক কোণে বিনোদিনীর সাথে মহেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব এবং মহেন্দ্রকর্তৃক সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার পর অসুস্থ বিপিনের সঙ্গে বিনোদিনীর বিবাহ এবং তৎপরবর্তী বিনোদিনীর বৈধব্য রাজলক্ষ্মীকে অন্তরে দহন করছিল। হয়তো বিনোদিনীর এই পরিণামের জন্য সে পরোক্ষভাবে নিজেকেই দায়ী করেছিল। তাই এই অপরাধবোধ থেকে সে বিনোদিনীকে তার নিজের সাথে নিয়ে এসেছিল বলে আমাদের মনে হয়। ফলে একটি যুবতী মেয়ে অকালবৈধব্যের পর পল্লীগ্রামে তার জীবন অতিবাহিত করবে এটা মেনে নেওয়া সচ্ছল পরিবারের রাজলক্ষ্মীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অবশ্য বিনোদিনীকে কেন্দ্র করে যে তার পুত্রের সংসারে কোন কালবৈশাখীর ঝড় উঠবে তা রাজলক্ষ্মী ভাবতে পারেননি। তাই মহেন্দ্রের অধঃপতন রাজলক্ষ্মীর মনকে তীব্র কষ্ট দিয়েছে। তাই পুনরায় বিনোদিনী মহেন্দ্রের সাথে ফিরে এলে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছে বিনোদিনীকে তাদের সংসার হতে দূরে রাখার। তাই সমগ্র জীবনব্যাপী নানাবিধ মানসিক সংকট রাজলক্ষ্মীকে সংসারের বাস্তবতা চিনতে সহায়তা করেছে।

নৌকাডুবি (১৯০৬)

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম উপন্যাস 'নৌকাডুবি' নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে ১৩১০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১৩১২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় ১৯০৬ সালে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন যে এই উপন্যাসে "ঘটনা গ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ। তাই অস্বাভাবিক অবস্থায় মনের রহস্য সন্ধান করে নায়ক নায়িকার জীবনে প্রকাণ্ড একটা ভুলের দম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল।" (Tagore R. , 1427, p. 206) উপন্যাস মানুষের জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিচ্ছবি। উপন্যাসে চরিত্রচিত্রনে নানাভাবে তার প্রভাব পড়ে। লেখকের কলমের ধার কখনো কখনো সাধারণ ঘটনাকে উপস্থাপনে পরম যত্ন অবলম্বন করে। কখনো অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রও তার গুরুত্ব হারায় লেখকের মমত্বের অভাবে। নৌকাডুবি উপন্যাসের ঘটনার সূত্রপাত এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘটা একটা নৌকাডুবির দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রসমূহের জীবন একটা নির্দিষ্ট গতিতে চলছিল, কিন্তু এই দুর্ঘটনা তাদের জীবনের পথ পরিবর্তন করল। রমেশ, কমলা, নলিনাক্ষ প্রত্যেকেই বিধিনির্ধারিত পথে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে গমন করল। ফলে "গল্পের কৌতুহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক।" (Tagore R. , 1427, p. 206) একদিকে স্বজনহারা কমলাকে নিয়ে রমেশের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং কমলার মানসিক আঘাতপ্রাপ্তি, অন্যদিকে স্ত্রীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে হারানোর পর নলিনাক্ষের সন্ন্যাসীসম জীবনের অতিবাহন এবং রমেশের অনুপস্থিতিতে হেমনলিনীর মানসিক পীড়া উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তার চরম পরিণতির দিকে। একদিকে নারীর সম্বন্ধে নিত্যতার প্রশ্ন এবং অন্যদিকে প্রেমাস্পদকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা উপন্যাসে দুই প্রধান নারীকে নানা মানবিক সমস্যায় জর্জরিত করেছে। এখন কমলা, হেমনলিনী এবং খেমংকরী -এই তিন নারী চরিত্রের মানসিক সংকটের যে চিত্রায়ন রবীন্দ্রনাথ তার নৌকাডুবি উপন্যাসে করেছেন তার আলোচনা করা যাক।

'নৌকাডুবি' উপন্যাসে কমলার মানসিক সংকটের আলোচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্ব রাখে:

"... নারীকে লজ্জাশীলতা, ধৈর্য, করুণা ও কোমলতা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ কোথাও তাহাকে হীন করেন নাই। সকল খাঁটি প্রেমের মধ্যেই খানিকটা আত্মসমর্পণের ভাব আছে। কিন্তু আত্মসমর্পণ যেখানে মনুষ্যত্বকে খর্ব করে, স্বাধীনতাকে পঙ্গু করে, ব্যক্তিত্বের মহিমাকে ম্লান করে, সেখানে উহা অলংকার নহে, কলঙ্ক।" (Chattopadhyay, 2018, p. 51)

রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী চরিত্রসমূহ নিজেদের সৌন্দর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্ম সংযমের পরীক্ষা বার বার দিয়েছে। কমলাও তার ব্যতিক্রম নয়। যৌবনের প্রারম্ভে আকস্মিকভাবে বিবাহ তার মধ্যে যে ভালোবাসার সূত্রপাত ঘটিয়েছে তাতে সে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে রমেশকে। আবার, দিনের পর দিন রমেশের সজ্ঞানে তাকে প্রত্যাখ্যান তার মানসিক যন্ত্রণাই বৃদ্ধি করেছে। নারী-পুরুষের বিবাহিত জীবনের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ দুটি মানুষকে এক সূত্রে বেঁধে রাখে তার ব্যতিক্রমী চালচলন মনের মধ্যে যে অতৃপ্তির জন্ম দেয়, একমাত্র ভালোবাসাই সেই ক্ষতের মলম হতে পারে।

কমলা এক নিষ্ঠাবান ভারতীয় নারীর মতো রমেশকে স্বামীজ্ঞানে তার সেবা করেছে। তবে রমেশের উদাসীন আচরণে তার মনে হয়েছে এই মর্যাদাহীন গৃহিনীপণায় তার সম্মান নেই। তাই সেও একটা মানসিক দূরত্ব রচনা করে নিয়েছে:

"কমলা আজ একটা কল্পনালোক অধিকার করিয়া বেশ গুছাইয়া বসিয়া ছিল। রমেশ যদি বেশ সহজে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত তবে সুখেরই হইত। কিন্তু তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া ফেলা হইল। কমলাকে ছুটির সময় স্কুলে বন্দী করিয়া রাখিবার চেষ্টা, স্টিমারে রমেশের ঔদাসীন্য, এ সমস্তই মনের তলদেশে আলোড়িত হইয়া উঠিল। কাছে পাইলেই যে পাওয়া হইল, তাহা নহে-আসল জিনিসটি যে কি তাহা গাজীপুরে আসার পরে কমলা অতি অল্পদিনেই যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে।" (Tagore R. , 1427, p. 281)

আবার, যখন তার মন ধীরে ধীরে চক্রবর্তীকন্যা শৈলজার সান্নিধ্যে এসে রমেশের প্রতি অনুকূল হতে শুরু করে তখনই তার জীবনে এক মর্মান্তিক ট্রাজেডি যেন অপেক্ষা করে ছিল। রমেশের হেমনলিনীকে লেখা পত্র পাঠ করে তার রমেশের সঙ্গে রচিত সংসারের মোহভঙ্গ হয়:

"কমলা শোবার ঘরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া প্রদীপের আলোকে আরেকবার রমেশের সেই চিঠি লইয়া বসিল। চিঠি যাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হইয়াছে তাহার নাম নাই, ঠিকানা নাই। কিন্তু সে যে স্ত্রীলোক, রমেশের সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল ও কমলাকে লইয়াই তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেছে, তাহা চিঠি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়। যাহাকে চিঠি লিখিতেছে, রমেশ যে তাহাকেই সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসে এবং দৈব দুর্বিপাকে কোথা হইতে কমলা তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়াতেই অনাথার প্রতি দয়া করিয়া এই ভালোবাসার বন্ধন সে অগত্যা চিরকালের মতো ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এ কথাও চিঠিতে গোপন নাই।" (Tagore R. , 1427, p. 297)

হতচকিত কমলা এইবার রমেশের গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। কমলার এই বিশ্বাস জন্মে যে নৌকাডুবিতে যেহেতু সে বেঁচে আছে কাজেই তার স্বামীও ঠিক বেঁচে থাকবে। তাই সে অনির্দিষ্টের পথে পা বাড়ায়। এই মিথ্যা সম্পর্ক তার মধ্যে এক গ্লানির জন্ম দেয় এবং স্বামীকে খুঁজে বের করে তাকে নিজেকে আত্মসমর্পণেই সে নিজের মুক্তি খোঁজে। তবে স্বামী নলিনাক্ষকে খুঁজে পেলেও সে যখন

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

অবগত হয়েছে হেমনলিনীর সাথে নলিনাক্ষের বিবাহের প্রস্তাব ব্যাপারে, তখন তার মনোকষ্টকে সে চেপে রেখে, পরিচয় গোপন করে স্বামীর সেবার অধিকারটুকুকেই পেতে চেয়েছে। তার পত্নিত্বের সংস্কার তাকে স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতেই শিখিয়েছে। কমলার এই মানবিক যন্ত্রণার কোন ব্যাখ্যা বোধহয় হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ তার মানবিক সমস্যাকে ভারতীয় ঐতিহ্যের সংস্কারের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আবার কমলার মনে হেমনলিনীর প্রতি এক মানবিক সহানুভূতিরও প্রকাশকে আমরা লক্ষ্য করি নলিনাক্ষের সাথে তার বিবাহ ভেস্তে যাওয়ার পর:

"আজ হেমনলিনীর জন্য কমলা মনের মধ্যে বড়োই একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। হেমনলিনীর প্রশান্ত মুখে কী -একটা ভাব ছিল যাহা দেখিয়া কমলার চোখে যেন জল ভরিয়া আসিতে চাহিতেছিল। কিন্তু হেমনলিনীর কেমন একটা দূরত্ব আছে-তাহাকে কোন কথা বলা যেন চলেনা, তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যেন বাঁধে। আজ কমলার সকল কথাই হেমনলিনীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু সেই আপনার সুগভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া চলিয়া গেল, কেবল একটা-কী রাখিয়া গেল যাহা বিলীয়মান গোধূলির মতো অপরিমেয় বিষাদের বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ।" (Tagore R. , 1427, pp. 370-371)

অবশেষে তার সকল মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে স্বামী নলিনাক্ষকে তার প্রেমের সঞ্চিত অর্ঘ্য নিবেদন করে।

উপন্যাসে হেমনলিনী সবচেয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ চরিত্র। মাতৃহীন হেম পিতা অন্নদা বাবুর স্নেহের ছায়ায় প্রতিপালিত হয়েছে। দাদা যোগেন্দ্র জীবনে এক খাপছাড়া গোছের মানুষ হওয়ায় পিতার কাছে যেন সেই বিশেষভাবে স্নেহ পেয়েছে। তবে প্রেমাস্পদ হিসেবে সে শুধু রমেশের নয়, এমনকি তাদের ব্রাহ্মসমাজের অক্ষয়েরও কাম্য হয়েছে। যদিও অক্ষয়ের প্রতি তার কোনদিনই কোন অনুভূতি ছিল না। হেম অসাধারন রূপবতী না হলেও তার যে গুন ছিল তাই দিয়েই সে সকলের কাছে নিজের দ্যুতিতে প্রকাশমানা হয়েছে। অশোক কুমার মিশ্র মহাশয় হেমনলিনী সম্পর্কে লিখেছেন:

"হেমনলিনী 'নৌকাডুবি'র নায়িকা নয় । কিন্তু সবচেয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ চরিত্র সেই। তার জীবনের ট্রাজেডি বড় তীব্র। ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত সে। তার সমাজের অক্ষয় তাকে পত্নীরুপে চায়, কিন্তু সে চায় না। সে যাকে ভালবাসে সে হিন্দু পরিবারের রমেশ। তার পিতারও অমত ছিল না তাতে। কিন্তু তার চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মেলেনা এতটুকু। হেমের রূপ অসাধারণ না হলেও নিতান্ত সাধারণ নয়। তার চরিত্রের আকর্ষণীয়তা তার সৌকুমার্যে, তার বুদ্ধিদীপ্ত মুখের শান্ত মাধুর্যে।" (Mishra, 2017, p. 65)

নিতান্তই শৈশব থেকে সে মাতৃহারা। আবার সংসারে বাবা ও দাদা ছাড়া অন্য কোন নারী চরিত্রের উপস্থিতি না থাকায় তার নারীত্বের কোন যন্ত্রণাকেই কারো কাছে প্রকাশ করার অবকাশ হয়নি। তাই প্রকাশের অভাবই ক্রমে তাকে অন্তরমুখী করেছে। রবীন্দ্রনাথ চরিত্রটিকে শিক্ষিতা, আধুনিক মনস্কা ও উদারভাবে সৃষ্টি করেছেন। রমেশের সাথে তার প্রেমসম্পর্ক বিবাহে পরিণতি লাভ করতে যাওয়ার পথেই অজস্র বিঘ্ন তার মনকে যন্ত্রনাবিদ্ধ করেছে। আবার, বিবাহের দিন রমেশ হঠাৎ করে পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও সে বিচলিত হয়নি ঠিকই, তবে একটা মানবিক পীড়া তার মানসলোকের অন্তরে বারবার আঘাত করেছে। অবশ্য রমেশ এর উপরে সে অবিশ্বাস করতে পারেনি যখন রমেশ তাকে বলে "এই কথা আমাকে বলো যে তুমি আমাকে কখনো অবিশ্বাস করিবে না। আমিও অন্তর্যামীকে অন্তরে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি তোমার কাছে আমি কখনও অবিশ্বাসী হইব না" (Tagore

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

R. , 1427, p. 231) তখনও সে তার উপর বিশ্বাস রাখে।

দাদা যোগেন্দ্র ও অক্ষয়ের রমেশের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ তার অন্তরে দ্বিধাগ্রস্তভাবের সৃষ্টি করলে সে ভেঙে পড়ে:

"দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। পিতার জানুর উপর বুক চাপিয়া ধরিয়া তাহার অসহ্য রোদনের বেগ সংবরণ করিতে চেষ্টা করিল।" (Tagore R. , 1427, p. 246)

আসলে মনের যাবতীয় বিক্ষোভকে চেপে রেখে তাকে উপরে প্রফুল্লতার ভাব বজায় রাখতে হয়েছে। পিতার কথা চিন্তা করে সে নলিনাক্ষ্যর সাথে বিবাহে মতদান করেছে। তবে অন্তরে সে সংকুচিতই থেকেছে এই বিবাহব্যাপারে। তাই নলিনাক্ষের মা খেমংকরিও এই বিবাহ ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে এবং হেমনলিনীও স্বস্তি পেয়েছে। আসলে যাকে গুরুর মর্যাদায় সে দেখেছে তাকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার মধ্যে যে দ্বিধা তার চিত্তকে সংকুচিত করেছিল তার থেকে মুক্তি পেয়ে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। জীবনের অসংখ্য সমস্যার মধ্যেও সে রমেশের প্রতি অনুরাগকে কখনো ভুলতে পারেনি।। তবে তার মনোগত বেদনা একান্তভাবে তারই হয়ে থেকেছে। তার সীমাবদ্ধতাকে লেখক এভাবেই চিত্রিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলোতে আমরা মূলত যে সকল মায়েদের পরিচয় পাই এক আনন্দময়ী ব্যতীত কেউই সেভাবে মানবিকতার উচ্চতম সোপানে আরোহন করতে পারেনি। পুত্রকে ঘিরে নিরাপত্তাহীনতার বোধ ও তার থেকে অন্য নারীকে সংসারে আমদানি, আমাদের রাজলক্ষ্মীর মত মা সম্পর্কে এক বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করে। তবে চোখের বালির রাজলক্ষ্মীর তুলনায় ক্ষেমংকরি অনেকমাত্রায় মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন। পুত্র নলিনাক্ষের সন্ন্যাসীসম জীবন তাকে ব্যথিত করেছে। স্বামীর অধিক বয়সে পৌঁছে দ্বিতীয় বিবাহ করার পর তিনি মাতৃভক্ত এই পুত্রটির মধ্যেই তার সমস্ত কষ্টের উপশম খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই তাকে বিবাহ দিয়ে সুখী করবার মনোগত বাসনা বারবার আবেগতাড়িত করেছে। আবার, হেমনলিনীর উদাসীনতাও তার মনে সংকোচের সৃষ্টি করেছে। যার ফলে তিনি পুত্রের মনের ইচ্ছাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। আসলে তার সমস্ত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত জীবনদর্শন সম্পর্কে এক নতুন মার্গ প্রস্তুত করেছে যে পথে অন্যকে তার জায়গা করে দিতে তিনি পিছপা হন না। তাই কমলাকে গ্রহণ করার মধ্যেও তার মধ্যে কোন সংকোচ আমরা দেখি না। খেমংকরি চরিত্রের এই আধুনিক মনষ্কতা পুত্র নলিনের মানবিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা করেছে যার প্রতিফলন আমরা নলিনাক্ষের কমলাকে বলা এই কথার মধ্যে খুঁজে পাই:

"মা তাহার জীবনে অনেক অপরাধকে ক্ষমা করিয়া আসিয়াছেন, যাহা অপরাধ নহে তাহাকে তিনি ক্ষমা করিতে পারিবেন।" (Tagore R. , 1427, p. 373)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উপন্যাসসমূহ যদি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা দেখি তবে দেখব যে নারী চরিত্র সমূহের মানসিক সংকটাপন্ন অবস্থা ও তাদের নৈতিক অবস্থানকে এক গভীর দার্শনিক আলোকসম্পাতে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। নারী শুধু পুরুষের পাশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নয়, বরং তার অস্তিত্ব,নৈতিক চয়ন এবং বিধি-নিষেধের বেড়া ভেঙে তার মানবিক বোধের এক অনন্য দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ রচনা করতে চাইলেন।

করুণা ও বউঠাকুরানীর হাটের দিকে তাকালে আমরা দেখি সেখানে নারীর সামাজিক অবস্থান ও নৈতিকতার যে সংকট রবীন্দ্রনাথ চিত্রায়ন করেছেন, তাতে নারীর মানবিক সংকট ও

আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই বার্তাই যেন দিতে চেয়েছেন যে নারী শুধুমাত্র সমাজে পুরুষের সম্পত্তি নয়, তার স্বকীয় মূল্য রয়েছে। নারীত্বের অবমাননা কোন সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তুলতে পারে না। নৈতিকতা কোন বিশেষ ব্যক্তির জায়গীর নয় বরং সমাজের সকল শ্রেণীরই অধিকার।

'রাজর্ষি' উপন্যাস যেন এক নতুন দিক নির্দেশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে ধর্মের দার্শনিক দিকটিকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।। ধর্মের অনুশাসন যখন নৈতিক নিয়মকে উপেক্ষা করে তখন তা মানবতাকে ধ্বংস করে-এই সত্য রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সুমহান ধর্মীয় ঐতিহ্যের শিক্ষা হতে উপলব্ধি করেছেন। তাই ধর্মীয় অন্ধতার বেড়াজালকে তিনি ছিন্ন করার আবেদন রেখেছেন আপামর মানুষের কাছে। এখানে হাসি মেয়েটি যেন ধর্মের নৈতিকতার প্রতীক রূপে রাজা গোবিন্দমানিক্যকে নৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করালো। জগত সেই একই সৃষ্টিকর্তার প্রকাশ হলে অবলা জীবের এই নৃশংস বলি কেন? ধর্ম কি কেবল অন্ধ অনুশাসনের বেড়া? রাজাকে এই প্রশ্ন বিদ্ধ করেছে। তাই হাসির সংকট শুধু একটি সাধারণ মেয়ের নৈতিক সংকট হয়ে থাকেনি, বরং সমগ্র নৈতিক ব্যক্তির মানবিক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' সামাজিক উপন্যাস হিসেবে ব্যক্তির স্বাধীনতার সাথে সামাজিক নৈতিকতার বিষয়কে তুলে ধরেছে। বিধবা নারীর প্রেম ও আকাঙ্ক্ষা সমাজের সৃষ্ট বিধানে ফলপ্রসূতা পায় না, কেননা তা সমাজ স্বীকৃত নয়। ফলে তার মানবিক চাহিদা জন্ম দিয়েছে ঈর্ষার, যার বলি হয়েছে নিষ্পাপ এক নারী। ফলে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে সৃষ্টি হওয়া মানবিক প্রশ্ন যা দাবি করেছে তা হল নৈতিকতা কখনো মানবিক সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না। উপন্যাসে বিনোদিনীর সংকট সমাজের চোখে নিষিদ্ধ, কিন্তু মানবিকভাবে দেখলে তার সংকট সত্যই মর্মান্তিক।

রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে কমলার যে চরিত্রায়ন করলেন সেখানে প্রথমেই যে ভুল সম্পর্কের সমীকরণের সূত্রপাত করলেন রমেশ ও কমলার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, সেখানে কমলার নারীত্ব অবহেলিত হওয়ায় যে সংকট সৃষ্টি হল তা অত্যন্ত মানবিক। একটা ভুল মানুষের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক কখনোই সুস্থ সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই কমলার পবিত্রতা রক্ষা করে তাকে তার প্রকৃত স্বামীর গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছেন লেখক সুকৌশলে। রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখালেন যে নৈতিকতা কেবল নিয়ম নয়। সত্য ও আত্মসচেতনতা যদি দৃঢ় ভিত্তি হয় তবে নারী চরিত্রের সংকট কোন দুর্বলতা নয়, বরং তা নৈতিক জাগরণ ও আত্মপরিচয়ের পথ রচনা করে। তিনি দেখালেন যে সমাজের নিয়ম মানবিক সত্যের বিরুদ্ধে গেলে এবং বৈষম্যমূলক নৈতিকতা তার উপর আরোপিত হলে তা সমাজের জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে। তাই স্বাধীন নির্বাচনের অধিকার নারীর অবশ্যই রয়েছে। মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং সহানুভূতিই প্রকৃত মানবতা যা মানবিক সংকট হতে মুক্ত করে নারীকে তার উপযুক্ত অধিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তাই সমসাময়িক জটিল সময়েও রবীন্দ্রনাথের নৈতিক আবেদন আজও একইভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়েছে।

References:

- Chattopadhyay, B. (2018). *Rabindranath(Bengali Version).* Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad.
- Ghosh, J. (2017). *Nayoker Sandhane Rabindranath(Bengali).* Kolkata: Dey's Publishing.

- Mishra, A. K. (2017). *Uponyas Shilpi Rabindranath(Bengali Version).* Kolkata: Dey's Publishing.
- Roychaudhury, G. (2017). *Rabindra Uponyaser Nirmanshilpa.* Kolkata: Dey's Publishing.
- Tagore, R. (1426(Bengali year)). *Rabindra Rachanabali, Dwitiya Khanda(Sulovo Sanskaran), Bengali version.* Santiniketan, Birbhum: Visva-Bharati.
- Tagore, R. (1427 (Bengali year)). *Rabindra Rachanabali, Prothom Khanda(Sulovo Sanskaran), Bengali Version.* Santiniketan, Birbhum: Visva-Bharati.
- Tagore, R. (1427). *Rabindra Rachanabali, Tritiya Khanda(Sulovo Sanskaran), Bengali Version.* Santiniketan,Birbhum: Visva-Bharati.
- Tagore, R. (2004, March 1). *scribd.* Retrieved from www.scribd.com: https://www.scribd.com

----